দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20/১১/৯০
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

৩/

মেডিকেল কলেজে ভর্তি সংকট

সব মানুষের একটা লক্ষ্য থাকে এবং সেটাকে কেন্দ্র করে মানুষ সামনের দিকে অগ্রসর হয়। তাই অনেক ছেলে-মেয়েদের একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হয়— মেডিকেল কলেজে পড়ার। কিন্তু গত বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দুইবার হওয়াতে [ঢাকা বাদে] বহু ছেলে-মেয়ে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হননি। একমাত্র মেডিকেল ছাড়া দেশের অন্য কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নম্বর কর্তন করার কোন নিয়ম নেই। নম্বর কর্তনের ফলে অনেকের মেধা এবং প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মেডিকেলে ভর্তির আশা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে ২৫ নম্বর কর্তনের নিয়ম ছিল। সুতরাং শিক্ষামন্ত্রী ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আমাদের আকুল আবেদন, যাতে এ বৎসর আগের মত ২৫ নম্বর কর্তন না করা হয়।

—মোঃ মামুন অর রশীদ (সোহেল),
ভাটিখানা, বরিশাল।

॥ ২ ॥

মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনবারের বেশী কোন ছাত্র-ছাত্রীকেই ভর্তি পরীক্ষা দিতে দেয়া হয় না। তৃতীয় বছর কোন ছাত্রের পরীক্ষা দিতে হলে তাকে এসএসসি ও এইচএসসিতে মোট ১৩০০ নম্বর পেতে হবে। এই শর্তটিরও পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। যেহেতু দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের পরীক্ষার্থী হতে হলে ১২০০-এর বেশী নম্বরের অধিকারী হতে হয় যা ন্যূনতম যোগ্যতাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে একাধিকবার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ থেকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত করে। অনেক সময় এইচএসসি পাঠ্যসূচীর বাইরে থেকেও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন করা হয়, যা ভাল ছাত্রদেরও নিরাশ করে। যেমন— রসায়ন বিজ্ঞানের হাইড্রোজেন অধ্যায়।

তাই বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী কঠিন হতে পারে তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এই হ-য-ব-র-ল শিক্ষা ব্যবস্থার দেশে অন্ততঃ ভর্তি পরীক্ষাগুলোকে অযৌক্তিক শর্তের জটিলতা থেকে মুক্তি দিন।

—খালেদ সোহেল,
৯৮, বাঘমারা।

॥ ৩ ॥

আমরা কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের দুর্ভাগ্য যে, প্রতি বছরই এই বোর্ডে কোন কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং এর খেসারত দিতে হয় আমাদের মতো নিরীহ ছাত্রদের। প্রতি বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে এবার ঘটেছে সবচেয়ে বেশী কেলেংকারি। যার মূল্য দিচ্ছি আমরা। আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা অন্যান্য বোর্ডের প্রায় ১ মাস পরে শুরু হয় এবং শেষও হয় ওদের পরে। যার জন্য মেডিকেল বা ভার্সিটিতে ভর্তি হবার জন্য যতটুকু সময় পাওয়ার কথা সঙ্গত কারণে আমরা তা হতে বঞ্চিত হচ্ছি। তাছাড়া এত অল্প সময়ে সঠিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এইসব কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুরোধ, মেডিকেল কলেজ ও ভার্সিটি ভর্তির তারিখ যেন ১ মাস পিছিয়ে দেয়া হয়। গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে এটা আমাদের অনুরোধ।

—আতিকুর রহমান,
রায়ের গ্রাম, সিলেট।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন স্থগিত কেন?

১৯৮৯ সনের শেষদিকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে রেজিস্ট্রিভুক্তকরণ সম্পর্কিত একটি সরকারী আদেশ জারি হয়েছিল। নিঃসন্দেহে শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি সুসংহত প্রক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ ছিল। দেশে অনেক নতুন স্কুল গড়ে উঠছে। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী স্কুলের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পাঠদান কার্যক্রম ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পালিত ও পরিচালিত হওয়ার জন্য অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কাঠামো থাকা উচিৎ।

এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরা যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়েই সরকারী আদেশ মোতাবেক যার যার স্কুলের কাগজপত্র জমা দিয়েছিল। অতঃপর কিছু স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দেয়ার পর হঠাৎ করেই অজ্ঞাতকারণে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের উপর স্থগিতাদেশ জারি করা হয়। অদ্যাবধি সেই স্থগিতাদেশ বহাল থাকায় রেজিস্ট্রেশন পায়নি। এমন প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বেশী যে সমস্যাটির সম্মুখীন তা হলো— এই সব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা সরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। এমনকি এই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অন্য কোন স্কুল হতে ফিস দাখিল করে পরীক্ষায় অংশ নিলে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিল, বৃত্তিলাভ করলে বৃত্তি বাতিল, এমনকি যে স্কুলের শিক্ষার্থী এবং যে স্কুল হতে বৃত্তি পরীক্ষা দেবে, উভয় স্কুলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে— এইমর্মে না-কি সরকারী নির্দেশ আছে।

এমনিতে দেশের মানুষ দেশের বর্তমান অথর্ব নিষ্ফল শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস— ইত্যাদি কারণে উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত ও বীতশ্রদ্ধ। এর উপর যদি কোমলমতি কবিপ্রাণ শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ ন্যক্কারজনক দুরূহ দুর্বোধ্য জটিলতা ও হয়রানিমূলক ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে— তা হলে এই জাতিকে মূর্খ করে রাখার দায়-দায়িত্ব কারা বহন করবে? এই মূর্খ জাতির ভবিষ্যৎ পরিণতিটা ভেবে অরেজিস্ট্রিকৃত স্কুল হতে যাতে অন্ততঃ এবারের মত আসন্ন '৯১ সনের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে এবং রেজিস্ট্রেশন স্থগিতাদেশ বাতিল করে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন প্রদান কার্যক্রম চালু হয়— এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—নূরুল আমিন চৌধুরী,
অধ্যক্ষ, ট্যালেন্টস্ প্রিপারেটরী, চৌমুহনী,
ভাইস চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ কিণ্ডার গার্টেন এসোসিয়েশন,
চেয়ারম্যান,
চৌধুরী ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষাঙ্গনে যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে এতে এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকাসহ একটি বিশেষ মহল দেশবাসীর সামনে ছাত্র সমাজকে ক্রমাগত অবিশ্বাসের পাত্রে পরিণত করে ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তিকে কালিমালেপন করার অশুভ চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। অভিভাবকদের অন্তরে সন্তানদের নিরাপত্তার আশংকাকে ঘনীভূত করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। যা আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের অশিক্ষিত দেশের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করবে। অথচ বাস্তব ঘটনা সম্পূর্ণ উল্টো। কেননা, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাই সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি এবং সন্ত্রাসের কারণে ছাত্ররাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, একশ্রেণীর বহিরাগত পেশাদার মাস্তানরাই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস করে— যাতে ছাত্রদের উপস্থিতি বা সমর্থন কোনটাই থাকে না। অবশ্য এই বহিরাগত মাস্তানরা ছাত্র নামধারী। কিন্তু তাদের স্বরূপ সন্ত্রাসী, ছাত্র নয়। আমাদের পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় শতকরা ৯১.০৮% ছাত্র-ছাত্রীরাই মনে করে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের সাথে অ-ছাত্র বহিরাগতরাই জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও বারবার বলে আসছে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের স্বরূপ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনায় যারা জড়িত তারা বহিরাগত মাস্তান হওয়া সত্ত্বেও সংবাদপত্রে সন্ত্রাসের খবর পরিবেশনে ছাত্রদের জড়ানোর বদৌলতে জনসাধারণ ছাত্রদের পর্যায়ক্রমে ঘৃণার চোখে দেখছে কেন? এ অবস্থা ক্রমাগত চলতে থাকলে শিক্ষার প্রতি অনীহা ও ঘৃণা এবং সন্ত্রাসী অপবাদের ভয়ে এদেশে কোন ছাত্র আর উচ্চ শিক্ষালাভে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে না। তাতে দেশেরই ক্ষতি হবে সর্বাধিক।

তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে অনুরোধ জানাচ্ছি শিক্ষার স্বার্থে ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখুন— তাতে অন্ততঃ সন্ত্রাসের মূল কারণকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।

—তুহিন মালিক,
সাধারণ সম্পাদক,
ডাকসু সংগ্রহশালা।